ইস্যু নং: ০৫
২২ জানুয়ারি ২০০৮
দাম: ৪ টাকা

The Pitribhumi
পিতৃভূমি
ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটির মুখপত্র

Rebellion to a tyrant is obedience to God
-Thomas Jefferson

সম্পাদকীয় নোটের বদলে

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে খোলা চিঠি

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,

আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১২ জানুয়ারী রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে দেয়া আপনার ভাষণ আমরা শুনেছি। আপনি আপনার বক্তব্যে প্রধানতঃ গত এক বছরে অর্জিত সাফল্য, খাদ্যদ্রব্য বিশেষত চাউলের দাম বৃদ্ধির কারণ ও এ ব্যাপারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ভিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ধীরে ধীরে জরুরী অবস্থা তুলে নেয়ার কথাও আপনি বলেছেন। শেষে আপনি বলেছেন, "আমি দেখতে চাই, ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম বিশ্ব-সভায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

আপনাকে আমরা ২য় পাতায় দেখুন

রামগড়ে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর খুন

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। গত ৮ জানুয়ারী এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ঐদিন ঘর্তপাড়া নিবাসী তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী শামিনী (চামেলী?) ত্রিপুরা (পিতা মুং চন্দ্র ত্রিপুরা ও মাতা জ্যোতিনা ত্রিপুরা) সকালে যথারীতি সকালে স্কুলে যায়। তার স্কুলের নাম সোনাই আগা প্রাথমিক বিদ্যালয়, যা বাড়ি থেকে আনুমানিক দুই কিলোমিটার দূরে। স্কুল ছুটির বহুক্ষণ পরও বাড়িতে ফিরে না আসায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অভিভাবকরা তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। পরদিন তার লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় ধর্ষণের সুস্পষ্ট আলামতসহ বাড়ি ও স্কুলের মধ্যবর্তী জঙ্গলে পাওয়া যায়। কে বা কারা তাকে ধর্ষণের পর খুন করেছে তা তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করা যায়নি।

হিল উইমেন ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ১০ জানুয়ারী এক বিবৃতিতে উক্ত ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, একের পর এক পাহাড়ি নারী ধর্ষণের শিকার হলেও তার কোন প্রতিকার না হওয়া, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি না দিয়ে বরং প্রভাবশালী মহল কর্তৃক তাদের রক্ষা করার প্রচেষ্টাই এই বৃদ্ধির জন্য দায়ি।

সাম্প্রতিক নারী নির্যাতনের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ২ জানুয়ারী রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়াচর থানাধীন বাকছড়ি গ্রামে রুনু চাকমা (৩৫) পীং নাত্যা চাকমার ২য় পাতায় দেখুন

করল্যাছড়িতে কুটিরের জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র

৫০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা ■ বৌদ্ধ ভিক্ষু আটক, পরে জামিনে মুক্তি

বিশেষ রিপোর্ট: দীঘিনালায় সাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে বলপূর্বক সাধনা টিলা দখলে ব্যর্থ হওয়ার পর এবার খাগড়াছড়ি সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে করল্যাছড়িতে সর্বজন শ্রদ্ধেয় বনভান্তের এক শিষ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সারনাথ অরণ্য কুটিরের জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

সারনাথ অরণ্য কুটির

এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গত ১৪ জানুয়ারী কুটিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ আর্য জ্যোতি ভিক্ষুকে তার কুটির থেকে গ্রেফতার করা হয়। আব্দুল মজিদ (৫০) পীং মৃত আকাদ জামান নামে করল্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামের জনৈক সেটলার কর্তৃক মহালছড়ি থানায় দায়ের করা এক হাস্যকর ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলার ভিত্তিতে তাকে মাইসছড়ি পুলিশ গ্রেফতার করে। ৫০০ জন পাহাড়ির বিরুদ্ধে গাছ কাটা, চুরি ও সম্পত্তি বিনাশ ইত্যাদি হাস্যকর অভিযোগ আনা হলেও, এজাহারে কেবলমাত্র ১২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এদের মধ্যে একজন হলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু যার কথা একটু আগে বলা হয়েছে, এবং অন্য একজন বর্তমানে মৃত যার নাম ভুখ চাকমা। এ থেকে বোঝা যায় এই মামলা কত অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও প্রতিহিংসামূলক।

সর্বশেষ খবর: ২১ জানুয়ারি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানে সুবিধার জন্য বর্তমানে শুকিয়ে যাওয়া চেঙ্গী নদীতে একটি অস্থায়ী সেতু নির্মানে বাধা দেয়া হয়েছে। ২৫ জানুয়ারী এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে।

আদালতের কাছেও এ সত্য বোধগম্য হওয়ার কারণে শ্রীমৎ আর্য জ্যোতি ভিক্ষুসহ বাকি ১০ জনের জন্য সেদিনই জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। জামিন প্রাপ্তরা হলেন কিয়াংঘাট ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ চাকমা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুনীল জীবন চাকমা, বর্তমান মেম্বার ধর্মরাজ চাকমা ও দেব তরত চাকমা, কিয়াংঘাট মৌজার হেডম্যান বিদ্যা বিনোদ চাকমা, বাদুগোনালার সমীরণ চাকমা, করল্যাছড়ি মুখ গ্রামের মানিক লাল চাকমা ও বিজয় চাকমা, করল্যাছড়ি ভিতর পাড়ার কার্বারী নিখিল চাকমা ও একই গ্রামের কার্তিক চন্দ্র চাকমা। ২য় পাতায় দেখুন

বান্দরবানে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সিএইচটিনিউজ.কম

বান্দরবান ভূমি রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দ রুমা গ্যারিসন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হাজার হাজার পাহাড়ি উচ্ছেদ করে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ

গত ১৯ জানুয়ারী ২০০৮, শনিবার সকাল ১১:৩০ টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে উক্ত দাবি জানানো হয়।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে খয়চং মুরং বলেন, প্রশাসন রুমা সেনা গ্যারিসন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গ্যালেংগ্যা, পান্তলা ও সেংগুম মৌজার ৯,৫৬০.০০ একর জনবসতি জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন পান্তলা পাড়ার হ্লামংউ মার্মা, মংনুঅং মারমা, কৌলাঅং মারমা, রুইতো পাড়ার সিরোও মুরং, মধুর পাড়ার প্রুসাথোয়াই মারমা ও বট্তলী পাড়ার মংটিংওয়ং মারমা।

বুড়িঘাটের হাতিমারায় ভূমি বেদখল

সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলার বুড়িঘাটে সেটলাররা হাতিমারা গ্রামের অক্রমনি চাকমার (পিতা মৃত মল্লো চাকমা) নিজ নামীয় ৪ একর ও তার পিতার নামীয় ৬ একর পাহাড়ি জমি বেদখল করেছে। মাস্তান লিডারের ছেলে ওয়াহাব এর নেতৃত্বে কবীর ও আজিজ (আনসারের পিসি)সহ বেশ কয়েকজন সেটলার ঐ জমি বেদখল করে।

এছাড়া সেটলাররা শুক্র কুমার চাকমা, প্রগতি চাকমা, সুভাষ চন্দ্র চাকমা, পূর্ণ চন্দ্র চাকমা, বৃষকেতু চাকমা, হিরকেতু চাকমা, প্রতি চাকমা, প্রিয় রঞ্জন চাকমা ও সারথি চাকমা এই নয় ব্যক্তির ১৫ একর জলেভাসা (ফ্লিজ স্যাড) জমি জোরপূর্বক দখল করেছে।

ক্ষতিগ্রস্তরা এর প্রতিকার চেয়ে নান্যাচর থানার টিএনওকে অবহিত করলে তিনি গত ৩ জানুয়ারী ২০০৮ সেনা প্রহরায় তদন্তে আসেন। তদন্ত শেষে তিনি বেদখলকৃত জমিগুলো পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে ভাগ করে ভোগ দখল করার পরামর্শ দেন। তাতে রাজী না হলে পাহাড়িরা আইনের আশ্রয় নিতে পারবে বলে জানান। এছাড়া তিনি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত জমিতে চাষ না করার নির্দেশ জারী করেন। বর্তমানে পাহাড়িরা চাষের মৌসুমে জমি চাষ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে, সেটলাররা পাহাড়িদেরকে বিভিন্ন হয়রানি করছে ও ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

করল্যাছড়িতে কুটিরের জমি

১ম পাতার পর

ধর্ম পালনের অধিকার নেই

২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সারনাথ অরণ্য কুটির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য গত দেড় দুই মাস ধরে শত শত ধর্ম প্রাণ দায়িকা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কাজ করে আসছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সেনারা এ কাজে বাঁধ সাধে। বিজিতলা ও করল্যাছড়ি ক্যাম্পের সেনারা গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে কুটির এলাকায় অবস্থান নেয় এবং কুটির উন্নয়ন কাজ করা যাবে না বলে জানায়। তারা কুটিরে আসা স্বেচ্ছাসেবকদের হেনস্তা করে।

হাস্যকর নাটক

কুটির উন্নয়ন কাজ সম্পর্কে অপপ্রচারের হীন উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ির কিছু ভাড়াতে সাংবাদিককে ৫ জানুয়ারি কুটিরে নিয়ে আসা হয়। তাদের সাথে ৫০ জনের মতো সেটলার বাঙালিও ছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সেনাদের সেখানে কোন উপস্থিতি নেই সেটা দেখানোর জন্য কুটিরে অবস্থানরত সেনারা এ সময় পাশের ঝোপ ঝাঁড়ে লুকিয়ে থাকে। সাংবাদিকরা চলে যাওয়ার পরই তারা মুখচোরা শেয়ালের মতো সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। বানুর যেমন একই মুখ দিয়ে খায় ও মল ত্যাগ করে, তেমনি দু'এক জন সাংবাদিক সেনাদের টাকা খেয়ে ঐ নাগরদোলা সফর শেষে অশিষ্ট ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য উদ্গীরণ শুরু করে। ডেইলী স্টার পত্রিকার রিপোর্টার জসিম মজুমদার এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। ১২ জানুয়ারি প্রকাশিত তার লেখা আগাগোড়া এতটাই মিথ্যাচারে ভরা যে তা সমালোচনারও অযোগ্য। সাধারণ ধর্মীয় কার্যক্রমের মধ্যেও তিনি রাজনীতির গন্ধ পান; নাকি ধর্মের ওপর চলমান আক্রমণকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য এ তার মিথ্যা প্রচার?

কুটিরের জমি নাকি সেটলারদের!

মাইসছড়ি, করল্যাছড়ি, লেমুছড়ি, পামারীঢালা ও নুনছড়িসহ মহালছড়ির বহু গ্রামে সেনা সদস্যদের সহায়তায় পাহাড়িদের জমি জবরদখল করার পর সেটলাররা এখন সারনাথ অরণ্য কুটিরের জমিও তাদের বলে দাবি করছে। আশির দশকে সমতল জেলা থেকে উড়ে এসে তারা এভাবে পাহাড়িদের বংশ পরম্পরায় ভোগ দখল করে আসা জমিগুলো দাবি করে। অবশ্য এখানে মূল হোতা হলো সেনাদের উগ্রবাদী উগ্র সাম্প্রদায়িক একটি অংশ। তাদের কারণেই পাহাড়ে আজ কারো জীবনে শান্তি নেই।

সারনাথ কুটিরের বর্তমান মোট জমির পরিমাণ ১৮ একর। এর মধ্যে করল্যাছড়ি ভিতর পাড়ার কার্তিক চন্দ্র চাকমা, করল্যাছড়ি মুখ পাড়ার বাসিন্দা (বর্তমানে মৃত) ভুষ চাকমা ও নগেন্দ্র চাকমা এবং কিরাংখাটি গ্রামের গুণধর চাকমা প্রত্যেকে ৪ একর করে দান করেন। তাদের জমির খতিয়ান নম্বর হলো যথাক্রমে আর-১০, আর-৪০, আর-৪২ ও আর-২৩। বাকি ২ একর দান করেন করল্যাছড়ি ভিতর পাড়ার নন্দ কুমার চাকমা। তার জমির খতিয়ান নং আর-২৪।

আসলে সাধারণ সেটলাররাও অনেকাংশে উগ্রবাদীদের ষড়যন্ত্রের শিকার। তাদের প্ররোচনা ও অনেক ক্ষেত্রে চাপের কারণেই তারা পাহাড়িদের জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়। খেয়াল রাখা দরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনসহ অনেকের কাছে তারা সমতলে পুনর্বাসিত হতে আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু না, উগ্রবাদী সেনা ও আমলারা তাদেরকে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে জাতিসত্তা নিধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসে না। উগ্রবাদীদের এই মানসিকতা ও নীতির পরিবর্তন না হলে সমস্যা গভীর থেকে গভীরতরই হবে।

রামগড়ে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের

১ম পাতার পর

স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়। গত ৪ ফেব্রুয়ারী দুনু উজাই মার্মা নামে এক ষোড়শীকে বান্দরবানের দক্ষিণ বাইশারীর অধীন লোহাঝিরি থেকে গরু চড়ানোর সময় অপহরণ করা হয়। ১৭ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়িতে জনৈক সেটলার আরেমা মারমা (২০) নামে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। ২২ জুলাই চট্টগ্রামের বন্দর থানা এলাকায় সুজা চাকমা নামে ১৭ বছরের এক কিশোরী গণ ধর্ষণের শিকার হয়। ২৬ অক্টোবর মোত্তকা নামে ময়ূরখীল গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা মাইয়েনু মারমা ওরফে আনু (২৩) নামে এক জুম্ম নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় আনু প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে লক্ষীছড়িতে শালবন বৌদ্ধ বিহারে যাচ্ছিলেন। গত ৪ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে হাজছড়ি নামক স্থানে ১০ বছরের শিশু কুইক্রাসু অং মারমাকে ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষককে চিহ্নিত করা হলেও মানিকছড়ি থানা পুলিশ মামলা নিতে অস্বীকার করে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে খোলা

১ম পাতার পর

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে, আপনি এ দেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে সম্বোধন করতে "উপজাতি" শব্দটি পরিহার করেছেন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত থাকবেন যে চীনে বিশাল হান জাতি ছাড়াও মিয়াও সহ বহু ছোট ছোট জাতি বাস করে। চীন সরকার এ সব ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে কখনোই উপজাতি বলে সম্বোধন করে না; ন্যাশানালিটি বা সংখ্যালঘু জাতি বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এর কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার; একটি দেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতির সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দরকার তাদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা। আর তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একমাত্র জাতিগত সমানাধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। একটি জাতি ও উপজাতির মধ্যে মর্যাদা কখনোই সমান নয় এবং সেজন্য তাদের মধ্যে কখনোই প্রকৃত ঐক্য ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না। কোন ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে উপজাতি আখ্যা দেয়ার পেছনে উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৃহৎ জাত্যাভিমান (যাকে ইংরেজীতে বলে chauvinism) কাজ করে বলেই আমরা মনে করি। মানব ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে আধুনিক জাতি ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। পৃথিবী ছোট বড় বহু জাতিতে পরিপূর্ণ এবং তাদের বিকাশ অসম, অনেকটা নানা রঙের নানা জাতির ফুলে শোভিত একটি বাগানের মতো। বাগানের সব ফুল যেমন আকারে আকৃতিতে ও রঙের বাহারে এক ও সমান নয় এবং সব ফুল একসাথে ফোটে না, তেমনি পৃথিবীর জাতিগুলোও বিকাশের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। কোন জাতির পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে, কোন জাতি বিকাশের মধ্যবর্তী স্তরে এসে পৌঁছেছে, আর কোন কোন জাতি এখনো বেশ পিছিয়ে রয়েছে। মালি যেভাবে পরিচর্যা করে বাগানের সব গাছের ফুলগুলোকে ফুটতে সাহায্য করে, কোন একটি বিশেষ জাতের গাছের প্রতি পক্ষপাত করে না; একইভাবে রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো সকল জাতি ও জাতিসত্তাকে সমতার দৃষ্টিতে দেখা এবং যে জাতিগুলো পিছিয়ে আছে তাদের বিকাশে সাহায্য করা। আমরা আশাকরি, আপনার ১২ জানুয়ারীর ভাষণ ভবিষ্যতে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন তাদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকবে।

যাই হোক, আপনি এক বছর আগে ঠিক কি পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের মনে আছে। সে প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা বাহুল্যই হবে। তবুও এ কথা বলা দরকার, সে সময় যেভাবে ঘটনাগুলো ঘটছিল ও বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলো যে অবস্থায় ছিল, তাতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মতো আমরাও দেশের উন্নতি ও কল্যাণ চাই। চাই শান্তি ও স্থিতিশীলতা। এদেশে এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ হলো যোগ্য, দূরদর্শী ও সৎ নেতৃত্বের অভাব। কোন দেশ বা জাতির উন্নতির জন্য তিনটি উপাদান পরিশ্রম, মেধা ও সততা আবশ্যক। আমাদের দেশের জনগণের প্রথম দু'টি গুণাবলীর প্রাচুর্য থাকলেও সঠিক নেতৃত্বের অভাবের কারণে আমরা বার বার পিছিয়ে যাচ্ছি। এখন সবাই এক বাক্যে বলছে যে দেশ আর ১১ জানুয়ারীর আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু যারা দেশটাকে সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে ১১ জানুয়ারীর পরও আমরা তাদের মুখগুলোই ঘুরে ফিরে টিভি চ্যানেলে ও পত্রপত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি। এই যদি হয়, তাহলে দেশের আপামর জনগণের কি ভরসা যে দেশ আর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে না?

আসলে দেশের দুরাবস্থা ও পশ্চাদপদতাকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসততার আলোকে বিশ্লেষণ করা যাবে না। তাছাড়া সততার সংজ্ঞাই বা কি? কাদেরকে আমরা সৎ বলে জানবো? যাদের নাম দুর্নীতি দমন কমিশনের তালিকায় উঠেছে তারাই কি কেবল অসৎ? আর যারা এখনো সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়নি (অর্থাৎ দুর্নীতি করার সুযোগ পায়নি) তাদেরকে সৎ বলি কিভাবে? একটা কথা আছে, Honest are those who are not tested. মূল কথা হলো সমস্যার গভীরে যাওয়া। এক সময় মনে করা হয়েছিল বা এখনো মনে করা হয় যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিই হচ্ছে সমাধান। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই পদ্ধতি সমস্যা সমাধানের বদলে সমস্যারই অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই স্বীকার করে নেয়া ভালো যে, যতদিন পর্যন্ত দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হবে, ততদিন জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান আশা করা যায় না। কসমেটিক সমাধান নয়, দরকার আমূল পরিবর্তন।

সংক্ষিপ্ত চিঠিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে আরো লেখার আগ্রহ ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি।

ইতি, এক নিপীড়িত পাহাড়ি।

বান্দরবানের বালাঘাটায় জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর স্মারকলিপি

মাননীয়,
ড. ফকরুদ্দীন আহমদ
প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

মাধ্যম: জেলা প্রশাসক, বান্দরবান জেলা।

আবেদনকারী: বালাঘাটা এলাকাবাসী, বান্দরবান জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

বিষয়: বান্দরবান সেনানিবাস সম্প্রসারণ কল্পে বান্দরবান জেলাধীন বালাঘাটায় ঘন জনবসতিপূর্ণ জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন না দেয়ার জন্য এলাকাবাসীর আবেদন।

মহোদয়,
আমরা অবগত হয়েছি যে, বান্দরবান সেনানিবাস সম্প্রসারণ কল্পে জেলা শহর এলাকার মধ্যে অবস্থিত ঘন জনবসতিপূর্ণ বালাঘাটা মৌজায় মোট ১৩১.২৭ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব বর্তমান সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।
আমরা বালাঘাটা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ উক্ত প্রস্তাব বাতিলের জন্য বিনীত আবেদন জানিয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করছি।

ক. এলাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
বান্দরবান সেনানিবাস সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে তা বান্দরবান জেলা শহর এলাকার মধ্যে অবস্থিত এবং বান্দরবান পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড-এর অন্তর্গত। বান্দরবান - রাঙ্গামাটি জেলার সংযোগ সড়কের (যা "চন্দ্রঘোনা সড়ক" নামে অধিক পরিচিত) পাশে অবস্থিত এই এলাকা অত্যন্ত ঘন বসতিপূর্ণ। তাছাড়া, এখানে কৃষি জমি, বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ ও ফলজ বাগান রয়েছে। জনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলো হলো অক্ষ্যাছড়ি পাড়া, চিত্রসেন বৈদ্য পাড়া, লেমুছড়ি আগাপাড়া।

খ. বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের আবাসস্থল
প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ এলাকায় বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকজন বহু বছর ধরে বসবাস করে আসছেন। যেমন, তঞ্চঙ্গ্যা ১৫ পরিবার, চাকমা ৩০ পরিবার, মার্মা ১৫ পরিবার, হিন্দু ২৯ পরিবার, বড়ুয়া ১৯ পরিবার এবং মুসলিম ৮৮ পরিবার। এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে চাকুরিজীবী, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও দিনমজুর রয়েছেন।

গ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ এলাকায় ৩টি বৌদ্ধ বিহার ও ১টি মসজিদ রয়েছে। মন্দিরগুলো হলো অক্ষ্যাছড়ি পাড়ায় জ্ঞান রত্ন বৌদ্ধ বিহার, লেমুঝিরি আগাপাড়া বৌদ্ধ বিহার ও করুণাপুর বন বিহার। অপরদিকে মসজিদটি ব্রিগেড অফিসের সামনে অবস্থিত, যা হাজীপাড়া জামে মসজিদ নামে পরিচিত।

ঘ. অধিগ্রহণ প্রস্তাব জনকল্যাণ পরিপন্থী
বলা হয়ে থাকে দেশের সরকার ও সেনাবাহিনী জনকল্যাণের জন্য নিবেদিত। কিন্তু আলোচ্য বালাঘাটা জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব সকল বিচারে জনকল্যাণের পরিপন্থী। কারণ:
"১. প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ করা হলে আনুমানিক ২০০ পরিবার কৃষি-জমি, বাগান-বাগিচা, ব্যবসা, জীবিকা ও প্রতিষ্ঠিত ঘর-সংসারসহ উচ্ছেদের শিকার হবেন। এদের মধ্যে এমন পরিবারও রয়েছেন যারা প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে জীবদ্দশায় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বারের মতো জমি থেকে উচ্ছেদ হবেন। যেমন, মুক্তাধন তঞ্চঙ্গ্যা, নলিনী মোহন তঞ্চঙ্গ্যা, চিত্রসেন চাকমা ওরফে বৈদ্য (মৃত), চন্দ্র মোহন তঞ্চঙ্গ্যা (মৃত) ও থোয়াইচোপ্রু মার্মা প্রথমে ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে উচ্ছেদ হওয়ার পর বালাঘাটায় পুনর্বাসিত হন। এরপর তারা দ্বিতীয় বার উচ্ছেদের শিকার হন ১৯৮০ দশকের প্রথম দিকে যখন বালাঘাটায় বান্দরবান ব্রিগেড সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। সুতরাং আবার যদি বান্দরবান সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়, তাহলে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ কিংবা তাদের সন্তান সন্ততিরা আর এক দফা জায়গা জমি ও ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবেন।
"২. উচ্ছেদ হওয়ার পর আমাদের মধ্যে অনেক পরিবারের পথে বসা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। আর যদি ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়, তাহলেও বান্দরবানের মতো নিতান্ত ছোট একটি শহরে এতগুলো পরিবারের জন্য জমির সংস্থান হবে না। অর্থাৎ টাকা দিলেও জমি পাওয়া যাবে না। তাহলে আমাদের যে ছেলে মেয়েরা বান্দরবান শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজে পড়াশুনা করছে তাদের ভবিষ্যত কি হবে? আমরা কোথায় যাবো, কোথায় নতুন বসত খুঁজবো? আবার নতুন করে কোথায় ঘর সংসার পাতবো? আমাদের জীবন কি উচ্ছেদ হতে হতেই চলে যাবে?
"৩. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অধিগ্রহণের আওতামুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হলেও, তা কার্যত একটি অর্থহীন ব্যাপারই হবে। কারণ বিশেষত বৌদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষু ও শ্রমণরা খাদ্য, পানীয়, সেবা-শুশ্রূষা, অর্ঘ্য ও বিহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও বিকাল এলাকার লোকজন বা দায়ক দায়িকার ওপর নির্ভরশীল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এলাকা থেকে উচ্ছেদ হলে বা উক্ত এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকজন না থাকলে বিহারগুলো আপনাতেই পরিত্যক্ত বা উচ্ছেদ হয়ে যাবে। সুতরাং, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বাদ দিয়ে বাকি জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তার ফলাফল কার্যতঃ অপরিবর্তিতই থেকে যাবে। অর্থাৎ বৌদ্ধ বিহারগুলোও উচ্ছেদের শিকার হবে। তাছাড়া, পুরো বান্দরবান জেলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বনভান্তের কেবল যে একটি শাখা বিহার এখানে রয়েছে (করুণাপুর বন বিহার), তাও অধিগ্রহণের কারণে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। ফলে বান্দরবানে সাধারণভাবে ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং বিশেষত শ্রদ্ধেয় বনভান্তের শিষ্য ও অনুরাগী বিশাল সংখ্যক ভক্ত বিহার কেন্দ্রিক সদ্ধর্ম পালন করতে পারবেন না এবং এতে তাদের অন্তরে বঞ্চনার ভ সৃষ্টি হতে পারে।

ঙ. জনগণের মতামত উপেক্ষিত
একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকামী সরকার জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন নীতি, পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের মতামত নিয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত জনমতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। কিন্তু বান্দরবান সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য বালাঘাটায় জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেয়ার আগে যেমন সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের (potential victims) মতামত নেয়া হয়নি, তেমনি প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকার সময়ও আজ পর্যন্ত তাদের বক্তব্য শোনা হয়নি। এছাড়া সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণও যাচাই করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

চ. অধিগ্রহণের অযৌক্তিকতা
বান্দরবান সেনানিবাসের (৬৯ পদাতিক ব্রিগেড সদর দপ্তর) জন্য বাড়তি জমি অধিগ্রহণের আদৌ যৌক্তিকতা আছে বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ উক্ত সেনানিবাসের আওতাভুক্ত কি পরিমাণ জমি রয়েছে তার সঠিক তথ্য আমাদের জানা না থাকলেও, আমরা জানি যে সেনানিবাসের আওতার মধ্যে প্রচুর জমি খালি ও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমাদের মতে, নতুন জমি অধিগ্রহণ না করে সেনানিবাস কর্তৃপক্ষের উচিত উক্ত খালি জায়গার যথাযথ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এমনিতেই দেশে লোকসংখ্যা অনুপাতে জমির পরিমাণ কম। তার ওপর যদি এভাবে অনুৎপাদনশীল খাতে জমি অধিগ্রহণ করা হয় তাহলে দেশে সমস্যা বেড়েই যাবে এবং জমির ওপর আরো বেশী করে চাপ পড়বে। অথচ আমাদের উচিত দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি উৎপাদনের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহার করা।

ছ. আমাদের আবেদন
আমাদের উচ্ছেদ করে সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হলে তা আমাদের ওপর চরম অবিচার করা হবে বলে আমরা করি। সুতরাং সরকারের কাছে বিনীত আবেদন উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে বান্দরবান সেনানিবাস সম্প্রসারণ কল্পে বালাঘাটায় ঘন জনবসতিপূর্ণ ১৩১.২৭ একর জমির অধিগ্রহণ প্রস্তাব বাতিল বা না-অনুমোদন করা হোক।

লক্ষ্মিছড়িতে ভুজুলিচুক বিহার ও ভাবনা কেন্দ্রে আবার হামলা

"এখানে বুদ্ধ ঘর হবে না; আল্লাহ্-র ঘর হবে" - ক্যাপ্টেন সোহেল

খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়িতে সেনা সদস্যরা ভুজুলিচুক পাহাড়ের ছড়ায় অবস্থিত বৌদ্ধ ভাবনা কেন্দ্র ও বিহার আবার গুঁড়িয়ে দিয়েছে। উক্ত বিহার ও ভাবনা কেন্দ্রটি পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বজন শ্রদ্ধেয় পরম পূজ্য অরহৎ ভিক্ষু বনভান্তের এক শিষ্য কর্তৃক পরিচালিত।

পিতৃভূমির ভুজুলিচুক বিহারের ভিক্ষুগণ

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ এ ঘটনা ঘটে। ঐদিন সকাল ৮টার দিকে ক্যাপ্টেন সোহেলের নেতৃত্বে ইন্দ্র সিং কার্বারী পাড়া সেনা ক্যাম্পের ১৫ জনের একটি সেনা দল উক্ত বিহারে তৃতীয় বারের মতো হামলা চালায়। সেনারা প্রথমে একটি গর্তের ওপর নির্মিত কুটির ভেঙে দেয়। এরপর বুদ্ধমূর্তি রাখা ঘরের বেড়া ও চালা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। এ ঘরে তখন শুভ প্রিয় শ্রমণ গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

সেনা সদস্যরা বুদ্ধমূর্তিটি বিহারের উত্তর দিকে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তবে কিছুক্ষণ পর সেটি আবার কুড়িয়ে এনে বিহারের পূর্ব পাশে মাটির ওপর খোলা আকাশের নীচে রেখে দেয়।

উত্তর দিকে অন্য একটি কুটির ছিল, সেনারা সেটিও ভেঙে দেয়। গ্রন্থাবখানা, গোসলখানা ও বিশ্রামের স্থান তছনছ করে দেয়া হয়। ভান্তে ও শ্রমণদের ব্যবহৃত চীবর ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয়।

উক্ত ভাবনা কেন্দ্রে দুই ভিক্ষু ও এক শ্রমণ থাকেন। ভিক্ষুদ্বয়ের নাম শ্রীমৎ শ্রদ্ধা তিস্য থের ও শ্রীমৎ করুণা তীর্থ ভিক্ষু। শ্রমণের নাম শুভপ্রিয়।

ক্যাপ্টেন সোহেল ভান্তেকে বলেন, সরকারের অনুমতি নিলে এখানে থাকতে পারবে। নতুবা থাকতে পারবে না।

ভান্তে তাকে প্রশ্ন করেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে সরকারী অনুমোদন লাগবে এ কথা বাংলাদেশ সংবিধানে লেখা আছে কিনা। উত্তরে সোহেল বলেন নেই।

এরপর ভান্তের প্রশ্ন, সারা বিশ্বে যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করা হচ্ছে তাতে সরকারী অনুমোদন লাগে কিনা। এর উত্তরেও ক্যাপ্টেন সোহেল "না" বলতে বাধ্য হন।

ভান্তের শেষ প্রশ্ন ছিল নিজ নিজ ধর্ম পালন ও আচরণের অধিকার সবার সমান। তাহলে বুদ্ধ ভক্তি আপনাদের কি ক্ষতি করছে? কমান্ডার এর কোন উত্তর না দিয়ে নিশুপ থাকেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, "পেটের জন্য চাকরি করতে হচ্ছে" এবং ক্যাম্পে ফিরে যান।

ইতিপূর্বের ঘটনা

৩১ ডিসেম্বরের হামলা ছিল তৃতীয় বারের। ভুজুলিচুক ভাবনা কেন্দ্রে প্রথম বার হামলা চালানো হয় গত বছর ১৭ জুলাই। তকনাছড়ি সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন রায়হানের নেতৃত্বে এক দল সেনা সদস্য ঐ হামলা চালায়। সে সময় সেনারা ভাবনা কেন্দ্রটি গুঁড়িয়ে দেয় এবং সেখানে ধ্যানরত অবস্থা থেকে শাসন উচ্ছল ও নাইকিস্টিক শ্রমণ এবং তাদের সেবক বৈশিষ্ট্য চাকমাকে ধরে নিয়ে আসে।

"এখানে বুদ্ধ ঘর হবে না; আল্লাহ্-র ঘর হবে"

উক্ত ঘটনার পর দায়ক দায়িকারা নতুন করে বিহার ও ভাবনা কেন্দ্রটি নির্মাণ করে। তারা আবার শ্রদ্ধেয় বনভান্তের শিষ্য শ্রীমৎ শ্রদ্ধা তিস্য

ধ্বংসযজ্ঞের পর ভুজুলিচুক ভাবনা কেন্দ্র

থের, করুণা তীর্থ ভিক্ষু ও শুভপ্রিয় শ্রমণকে সেখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে।

ভিক্ষুদের তপস্যা ঠিকভাবেই চলছিল। কিন্তু ২১ ডিসেম্বর হঠাৎ ক্যাপ্টেন সোহেলের নেতৃত্বে ২০ জনের মতো এক দল সেনা সদস্য (৩০ ফিল্ড আর্টিলারী) আবার সেখানে হানা দেয়। সোহেল এ সময় ভান্তেকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং ভান্তেও তার উত্তর দেন। তাদের কথোপকথন নিম্নরূপ:

ভান্তেদের চীবর এভাবে ছিন্নভিন্ন করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়।

সোহেল: তোমরা কার নির্দেশে এখানে এসেছ?

ভান্তে: রাঙ্গামাটির বনভান্তের নির্দেশে এসেছি।

সোহেল: কত মাস হলো তোমরা এখানে এসেছ?

ভান্তে: দুই কি তিন মাস হলো।

সোহেল: কোথায় নিদ্রা যাপন করেন?

ভান্তে: গাছ তলায়।

সোহেল: তোমাদের কে আহার যোগায়?

ভান্তে: আমরা পিন্ডচরণ করি (অর্থাৎ লোকজনের ঘরে ঘরে গিয়ে আহার ভিক্ষা করি)। আর না পেলে খাই না।

এরপর সেনারা সেখানে ওড়ানো বুদ্ধ পতাকা নামিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে এবং তার বদলে একটি গামছা বাঁশ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। কমান্ডার সোহেল বলেন, "এখানে বুদ্ধ ঘর হবে না; আল্লাহ্-র ঘর হবে।"

কথোপকথনের সময় সেনারা ক্যামেরায় উক্ত দুই ভান্তে ও এক শ্রমণের ছবি তুলে এবং ভিডিও করে।

জোরপূর্বক মিটিং

ভুজুলিচুকে সর্বশেষ প্রতিক হামলার আগের দিন অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন সোহেল ক্যাম্পের চারপাশে গ্রামের পাহাড়িদের জোর করে ডেকে গ্রামের এক দোকানে মিটিং করেন। সেখানে তিনি বলেন, "সরকার থেকে অনুমতি পেলেই কেবল বিহার স্থাপন করতে পারবেন। তখন আমরা সহযোগিতা করবো।"

ধর্মীয় নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি

পার্বত্য চট্টগ্রামে আশঙ্কাজনকভাবে ধর্মীয় নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল গত বছর এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে। যেমন, গত১ ০ ফেব্রুয়ারী লক্ষ্মিছড়ি জোনের একদল সেনা আর্থমিত্র বৌদ্ধ বিহারে হানা দেয় এবং বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ শ্রদ্ধাতিস্য ভিক্ষুকে হয়রানি করে। আগষ্ট - সেপ্টেম্বরে সেনাবাহিনীর সহায়তায় অনুপ্রবেশকারী বেআইনী সেটলাররা বাবুছড়ায় সাধনা টিলা বন বিহারের ১০০ একরসহ মোট ৩০০ একর জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা চালায়। তারা বিহারের সাইন বোর্ড ভেঙে চুরমার করে দেয় ও ভাঙে, শ্রমণ ও দায়ক দায়িকাদের হেনস্থা করে। ১২ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আবদুল মতিন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার রোধ ও বেআইনী সেটলার পুনর্বসান কার্যক্রম সহজতর করার জন্যই এই বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। ৫ নভেম্বর বাবুছড়া জোনের কমান্ডার মেজর কামরুজ্জামান স্নেহময় চাকমা ও সন্তোষ জীবন চাকমাকে ক্যাম্পে ডেকে মাইকিং করে কঠিন চীবর দানের অনুষ্ঠান প্রচার না করার জন্য হুমকি দেন। এছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ভান্তেদের বহনকারী গাড়ি আটকানো হয়। ভান্তেদেরকে বিনা কারণে অনেক্ষণ রাস্তায় বসিয়ে রেখে হয়রানি করা হয়। জোর প্রতিবাদের পরই কেবল সেনারা তাদের ছেড়ে দেয়। ■